Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 485 - 493
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রফুল্ল রায়ের ‘মাটি আর নেই’ : অধিকার অর্জনের সন্ধানে এক অন্তহীন যাত্রা

ড. পারমিতা আচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, শ্রীভূমি, আসাম
Email ID : mumun7777@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Landlord, uprooted, struggle for life, land construction, settlement construction, farming, landless again, uncertain life.

Abstract
Economic inequality has divided the society in many ways. This division created the capitalist class on the one hand and the toiling masses on the other. In the context of a capitalist society, when the thinking becomes capitalist, the life of the marginalised class is plunged into uncertainty. The right of crops and green soil belongs only to humans. But the hegemonic claws of capitalist society axed all habitable space. As a result, the lower classes of the society have to lose land again and again. They move from place to place like nomads. Plains, jungles, dense forests – everywhere they plow in search of land. By clearing the forest, clearing the weeds, they create habitable land in return of inhuman labour. From the firm fist of the forest, the wet juicy soil is brought out. As a result of their combined efforts, golden crops emerged on that fertile land. But then suddenly someone appeared with the ownership of that land. And again, they are landless and move from place to place. Hoping for a piece of land. They live through such uncertainty and struggle throughout their lives. They have no identity, no land, no soil. Novelist Prafulla Roy brings out this cruel form of society through the life struggle of Kubera Saidar, Moti, Gagan, Bilas, Kunj, Gupi, Nishi, Bhatuni's. In this article we will discuss his novel "Mati Aar Nei" from this point of view.

Discussion

"উপন্যাস যেমন চেতনার দিগন্ত-বিস্তার – তেমনি একই সঙ্গে নিজেকে চিনে নেওয়ার শিল্পও বটে।"[১]

সমালোচকের এই ভাষ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় আমাদের। কেননা জীবন সুবিশাল, সেই জীবন প্রবাহের স্রোতস্বিনী ধারাকে ধারণ করে গড়ে ওঠে উপন্যাসের বিস্তৃত কলেবর। লেখক ও পাঠকের দ্বিবাচনিক গ্রন্থনায় ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হতে থাকে সমাজ, সময় ও ব্যক্তির উচ্চারিত/ নিরুচ্চারিত ভাববিশ্ব। পাঠকৃতির গভীরে অবগাহন করতে করতে আমরা অর্জন করি সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি, যার মধ্য দিয়ে সমস্ত পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের বলয়কে কেটে নবরূপে প্রত্যক্ষ করি আপন সত্তাকে।

অন্যদিকে আমাদের চেতনাও সমৃদ্ধ হতে থাকে এই সমাজের পাঁকে পাঁকে জড়ানো মুখ ও মুখোশের পার্থক্যকে অনুধাবন করে। বহুধা বিভক্ত এই সমাজ আপন সুবিধা ও স্বার্থের জন্যে নিরন্তর সৃষ্টি করে যায় সত্য বিভ্রম। আধুনিক সমাজে যেখানে জীবনচর্যা এমনিতেই নানান কূটাভাসে জটিল, সেখানে এই সত্যভ্রমের কুহকতায় ভাবাদর্শও বদলে যায় বারে বারে। ফলত প্রাধান্য পেতে থাকে সুবিধাবাদী শ্রেণী এবং ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আধিপত্যবাদী প্রতাপের ঊর্ণাজাল, সর্বত্র। বিত্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ভিত্তিক নানান বিভাজনকে আশ্রয় করে বিস্তারিত হয় প্রতাপের করাল থাবা। অবধারিতভাবেই মেরুকরণ ঘটে যায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে। একদিকে জৌলুসপূর্ণ বিত্তবান আধিপত্যশ্রেণী, আর অন্যদিকে দারিদ্রপীড়িত প্রান্তিকায়িত ব্রাত্যজন। বেঁচে থাকার অবিরত সংগ্রামে এরা বিধ্বস্ত। তবুও আমৃত্যু রেহাই নেই প্রতাপের শৃঙ্খল থেকে।

ঔপন্যাসিক হলেন প্রজ্ঞাবান ত্রিকালদর্শী। যুগ যুগ ধরে সমাজের পরতে পরতে বিছিয়ে থাকা প্রতাপের বহুরূপী শৃঙ্খল তাঁর সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আর তাই ঔপন্যাসিক আকরণ হয়ে ওঠে তাঁর অন্যতম হাতিয়ার, যার মধ্য দিয়ে তিনি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে তুলে ধরেন সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে প্রতাপের বহু বিচিত্র রূপ। মানবতাবিরোধী সময় ও প্রেক্ষিতকে সাহিত্যিক দর্পণের মতো তুলে ধরেন আমাদের সামনে সত্য উন্মোচনের তাগিদে। সমালোচকের ভাষ্য অনুযায়ী,

> "ঔপনিবেশিক নির্মিতি এঁরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে প্রান্তিকায়িত সত্তাকে নানা প্রকরণে, আখ্যানের বিবিধ বিন্যাসে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন।"[২]

এভাবেই প্রতাপের সমস্ত জটিল গ্রন্থনাকে অস্বীকার করে চলতে থাকে সত্য উন্মোচনের প্রক্রিয়া এবং চেতনার বিনির্মাণ। আখ্যান বয়নের মধ্য দিয়ে তিনি একে একে উদ্ঘাটিত করতে থাকেন প্রতাপের সমস্ত কৃৎকৌশলকে। এভাবেই আমরা ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায়ের কথাবিশ্বে প্রত্যক্ষ করি আধিপত্যবাদীগোষ্ঠী নির্মিত নানান অচলায়তনের স্বরূপকে এবং তার বিপরীতে সেই অসাড়তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দিয়ে প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চিরকালীন মানবিক অধিকার ও অনুভূতিকে।

ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় ১৯৩৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। '৪৭ এর দেশভাগের পর সপরিবারে তাঁকে চলে আসতে হয় কলকাতায়। তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত ঘটে পঞ্চাশের দশক থেকে। স্বভাবতই তাঁর কথাবিশ্বে উঠে আসে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ও সমাজের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট। এই সময়ের মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি এবং তার প্রভাবে বদলে যাওয়া ব্যক্তিজীবন তাঁর উপন্যাসের মূল অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে।

এই সময়পর্বে কিছুটা আলোকপাত করলে দেখব, দীর্ঘ সময়ের ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে যখন আমাদের দেশ মুক্ত হয়, তখন স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে এলেও তা প্রকৃত অর্থে কোনো আলোর বার্তা বহন করে আনে না সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর জীবনে। পরাধীনতার হাত থেকে স্বাধীনতার অর্থ আসলে সমাজের সর্বস্তরে সবধরণের একনায়কতন্ত্রের অবসান এবং জনগণের সার্বিক উত্থান। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়ায় তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে রাজধ্বজার হাতবদল ঘটে শুধুমাত্র। দীর্ঘকালের ঔপনিবেশীকৃত মন স্বাধীনতা অর্জন করলেও বুঝতে পারে না এর প্রকৃত তাৎপর্যকে। অথবা এর স্বরূপকে। ফলত ঔপনিবেশিক শাসকদের বিদায়ের পর তৎকালীন সমাজের অভিজাতবর্গ ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথারীতি অব্যাহত থাকে আধিপত্যবাদী কাঠামো পূর্বের মতোই। নিম্নবর্গীয় দরিদ্র আপামর জনসাধারণের জীবনে শাসনতন্ত্রের জোয়াল বিন্দুমাত্রও সরে যায় না। শুধু শাসকের ও পীড়নের রূপবদল হয় মাত্র। তাই এবার পরিবর্তিত সময় ও পরিবর্তিত সমাজের প্রেক্ষিতে শুরু হয় আরও এক স্বাধীনতার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার নবতর সংগ্রাম। সামাজিক পরিস্থিতি হয়ে উঠল বহুমাত্রিক, যেখানে চেতনা অর্জন করে জীবনের অন্য মানে। এবার সংগ্রাম কোনো বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ – নিজেরই দেশের ক্ষমতা লোভী, আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই।

ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী সময় ও সমাজের পটভূমিতে প্রতাপের এই জটিল সমীকরণ এবং প্রান্তিকায়িতবর্গের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন বড় গভীরভাবে, যা সরাসরি উঠে আসে তাঁর একের পর এক উপন্যাসে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস যেমন, 'ভাতের গন্ধ' (১৯৮১, করুণা প্রকাশনী), 'আকাশের নীচে মানুষ' (১৯৮১, দে'জ পাবলিশিং), 'মানুষের যুদ্ধ' (১৯৮৩), 'ধর্মান্তর' (১৯৮৪, দে'জ পাবলিশিং), 'দায়বদ্ধ' (১৯৮৬, দে'জ পাবলিশিং), 'শান্তিপর্ব' (১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং), 'প্রস্তুতিপর্ব' (১৯৯০, করুণা প্রকাশনী), 'জনগন' (১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স) 'রথযাত্রা' (১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৯৯, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির), 'যুদ্ধযাত্রা' (১৯৯১,দে'জ পাবলিশিং) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক বিরাট পটভূমির মানুষের প্রতাপ-লাঞ্ছিত জীবনের সংগ্রামশীল বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর রচিত অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্য দিয়েও তিনি দরিদ্র নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনসংগ্রামের কাহিনিকে নিরন্তর ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কথাবিশ্বের জগতে। উল্লিখিত উপন্যাস-গল্পসম্ভার, উত্তর-বিহারের প্রান্তিকায়িত মানুষদের জীবনযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও আমরা জানি ক্ষমতার ঊর্ণাজাল কখনই স্থানবিশেষে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। তার সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তৃত হয় সর্বত্র। ভিন্ন ভিন্ন রূপে। তাঁর 'মাটি আর নেই' উপন্যাসটিতেও আমরা ক্ষমতায়নের সেই আগ্রাসী রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করি। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে।

এর আখ্যানভাগ পর্যালোচনা করলে দেখব, বঙ্গোপসাগরের অরণ্যসঙ্কুল উপকূলভূমিতে, 'বাঙলা দেশের দক্ষিণ সীমান্ত' অঞ্চলে একদল যাযাবর মানুষের আগমন ঘটে। যেহেতু ততদিনে দেশবিভাজন ঘটে গেছে, তাই ঔপন্যাসিক কথিত 'বাঙলা দেশ' বলতে আমরা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে বুঝতে পারি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তে বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে এরা আসে বাসযোগ্য ভূমির অন্বেষণে। কুবের সাঁইদার এদের মুরুব্বি। তাঁর উপর ভরসা করে মোতি, গগন, বিলাস, কুঞ্জ, গুপী এবং অন্যান্যরা নিজেদের পরিবার সমেত এসে উপস্থিত হয় এই উপকূল সংলগ্ন ভূমিতে। গহীন অরণ্য কঠোর শ্রমে পরিষ্কার করে তারা একে বাসযোগ্য করে তোলে। এরা সবাই তথাকথিত সমাজের বর্ণ বর্গ বিভাজিত দৃষ্টিকোণ থেকে নিচুজাতির (মালো, কাহার, বাউরী, বাগদী) দরিদ্র মানুষ। এরা 'নির্ভূম'। চিরকাল এরা ভূমির সন্ধানে নানান স্থান ভ্রমন করেছে, পতিত জমিকে আবাদ করেছে, বন কেটে বসত গড়েছে। কিন্তু এই শ্রমসাধ্য নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন তারা মাত্র সেই ভূমিতে বাস করতে শুরু করেছে, প্রতিবার জমিদার বা জমিমালিকের লোক এসে উপস্থিত হয়েছে 'টাঙি-বল্লম হাতে'। 'এদের বসত ভেঙে উৎখাত করে দিয়েছে' এবং এরা পুনরায় ভূমিহীন হয়ে 'নতুন মাটির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে'। এই-ই তাদের জীবন। এভাবেই তারা এখানেও আসে। পুনর্নির্মাণ করে বসতভূমি। তাদের সংগ্রামই তাদের জীবনালেখ্য।

আসলে ধনতান্ত্রিক সমাজের জাঁকজমকপূর্ণ অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি সোচ্চার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেই আপন অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে উপনিবেশোত্তর চেতনা সমৃদ্ধ প্রতিবেদন। যেখানে দৈনন্দিন জীবনের সুসজ্জিত আলোকসজ্জাই আমাদের নজর কাড়ে বেশি এবং সত্যের বদলে উৎপন্ন করে সত্যভ্রম; আমাদের মনে হয় জীবন বুঝি বা এরকমই আলোকের রোশনাই - আমরা শুধু ব্যর্থই হই না, বিস্মৃতও হই জীবনের যথার্থ স্বরূপ সন্ধানে। মগ্ন হই বিলাসী জীবনের মাদকতায়। তাই প্রদীপের নিচেই জমাট বাঁধে যে গাঢ় অন্ধকার, তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না বড় সহজে। আচ্ছন্নতার সেই ঘোর কাটাতে তখন সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ঔপন্যাসিক আকরণের অন্তহীন পরিসরে বহুকৌণিক বিন্যাসে প্রতিফলিত হতে থাকে যখন জীবন, সময়, সমাজ ও ব্যক্তি; আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে থাকে এই তথাকথিত চাকচিক্যপূর্ণ সমাজের অন্ধবিন্দুগুলি। ক্ষমতালোভী শাসকের নির্মম আগ্রাসনের শিকার হয়ে বিভাজন, বিভেদ, বৈষম্য, পরিসরহীনতা সমস্তই কিভাবে চোরাস্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ে সমাজের খাঁজে খাঁজে, তা আমাদের সচকিত মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রতাপের এই আগ্রাসনের সম্মুখে বারে বারে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় ব্যক্তিজীবনের তথা গোষ্ঠীজীবনেরও। এভাবেই গুপী-কুবের'রা বারে বারে মুখোমুখি হয় এই সত্যের যে 'মাটি আর নেই'। মাটি হারানোর যন্ত্রণা তাদের জীবনকে স্থির হতে দেয় না কিছুতেই। অনবরত স্থানান্তরিত হতে হতে একসময় অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা লক্ষ্য করে, - "এই পর্যন্তই মাটির সীমানা। মাটি ফুরলো তো শুরু হল জল। যতদূর তাকান যায়—কালো নোনা অফুরন্ত জল, অশান্ত গর্জন আর পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ। এর নাম সমুদ্র।..." (পৃ. ৯)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমরা দেখি, আখ্যান পরিসর নির্মাণ হয় যেখানে তা বঙ্গোপসাগরের জটিল অরণ্যসঙ্কুল উপকূল। লোকসমাজের দৃষ্টির বাইরে, জানার বাইরে উপকূল সংলগ্ন এই গহন অরণ্যভূমি। এ ভূমি বাসযোগ্য তো নয়ই, বরং প্রকৃতির রূপ এখানে অনেকটাই ভয়াল। 'শঙ্খিনী সাপ...ডোরাকাটা বাঘ...কুমীরের পাল' এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। একটা নদী উত্তর থেকে দক্ষিণের এই সমুদ্রে এসে মিশেছে। আর সেই "নদীর পার ধরে ধরে একদল মানুষ একদিন এখানে এসে হানা দিল।" (পৃ. ৯) এরা কারা? 'তারা আধা যাযাবর, আধা গৃহী।' কিছু ভূমিহীন মানুষ।

'গৃহী' মানুষ যখন বাধ্য হয় 'যাযাবরে'র মতো জীবন যাপনে এবং পরিণত হয় 'আধা যাযাবর, আধা গৃহী'তে, তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না কোন সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসে 'ওরা'। গৃহী মানুষের জীবন যাপন স্থিতিশীল হয়। 'আধা গৃহী' শব্দবন্ধের মধ্যেই রয়েছে সেই গৃহকেন্দ্রিক জীবনযাপনের ইঙ্গিত। কিন্তু সেই 'গৃহ' স্থায়ী হয় না যখন, তখন পুনর্বার গৃহের সন্ধানে যাত্রা শুরু করতে হয় তাদের, যা তাদেরকে নিয়ে যায় এক 'যাযাবর' জীবন যাপনের অভিমুখে। কিন্তু কেন স্থায়ী হয় না তাদের ঘর? আখ্যানের কেন্দ্রিয় চরিত্র গুপীর বয়ান থেকে ঝলসে উঠে জীবন সংগ্রামের তপ্ত অভিজ্ঞতা, "...এই পিরথিমীতে আমাদের জমিন লেই, ঘরবসত লেই, নিজের কইতে কিছু লেই। ...যেখেনেই আমরা ডেরা বাঁধি, জমিন হাসিল করি, ফসল ফলাই, ভাঙা মাটি চোরস করি, বন কেটে বসত বানাই, সেখেন ঠেঙেই জমিনদার আর ভেড়িবাবুদের লোকেরা আমাদের তাড়ায়। ...তাড়া আর খেদানি খেতে খেতে পিরথিমীর শেষ মাথায় এই সমুদ্দুরের মুখে এসে পড়েচি। এখনও নিজেদের জমিন হল নি।" (পৃ. ১৩) পাঠকৃতির সূচনাতেই এভাবে ঔপন্যাসিক বয়ানে স্পষ্ট ভাষায় ফুটে ওঠে প্রতাপের গহীন গভীর কূটচালের আঁকাড়া বাস্তব রূপ।

জমিমালিকদের জমির প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি যে কত শত মানুষের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে, তার সাক্ষী ইতিহাস বহন করে চলেছে চিরকাল। 'দুই বিঘা জমি'র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপেন যেন কাল থেকে কালান্তরে সেই সমস্ত নির্যাতিত নিপীড়িত উৎখাত ভূমিহীন মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে আজও দেশময় ঘুরে বেড়ায়। তাঁর সময়কাল থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেও আশির দশকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত আলোচ্য উপন্যাসে সেই সামাজিক সত্য যে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয় নি এরই প্রমাণ মেলে গুপীর বক্তব্য থেকে। স্বাধীন ভারতে জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত হয়ে গেলেও জমির উপর থেকে জমিমালিকদের বজ্রমুষ্ঠি তখনও শিথিল হতে চায় নি। বরং নামে বেনামে জমির দখলদারি অব্যাহত থাকে। যার অনিবার্য প্রভাব এসে পড়ে প্রান্তিকায়িত দরিদ্র মানুষদের জীবনে। স্বাধীনতার ফলস্বরূপ স্বাধীন জীবনযাপন করা তাদের ভাগ্যে আর ঘটলই না। হয় তাদের থাকতে হল কোন না কোন জমিমালিকের অধীন হয়ে অথবা সম্পূর্ণ নির্ভূম হয়ে। এছাড়া রয়েছে বর্ণগত জাতিগত বিভাজন। সমাজের যেখানে উচ্চবর্ণের বিত্তবান মানুষদের অবস্থান, সেখানে বাউরী, বাগদী বা কাহার সম্প্রদায়ের মানুষদের উপস্থিতি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সমাজের মূল স্রোত থেকে বহু দূরে এদের অবস্থান। কুবের, গুপী, বিলাস'রা আসলে সেইসমস্ত বঞ্চিত মানুষদেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

পাঠকৃতির নিবিড় পাঠে এরপর আমরা দেখি, এবার শুরু হয় সেই আরণ্যক ভূমিকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য গুপীদের প্রাণপণ চেষ্টা। যা তাদের জন্য প্রায় স্বাভাবিক কাজ। জীবনকে তারা যেভাবে পেয়েছে সেখানে স্থিরতা যেন কোথাও নেই। তাই এই অনিশ্চয়তায় তারা ঘাবড়ায় না। বরং সেরকম ঘন মনুষ্যবিহীন অরণ্যভূমি দেখলে তারা প্রস্তুত হয় সে স্থানকে বাসযোগ্য করে তুলতে এবং সেই কাজ তারা সম্পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। তাদের এই নিঃশব্দ অমানুষিক কর্মক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলছেন, - "কত জায়গা যে এরা আবাদ করেছে, কত পতিত নিষ্ফলা মাটিকে যে এরা সুফলা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বন কেটে জমি হাসিল করে পৃথিবীর সীমানাকে বাড়াতে বাড়াতে তারা চলেছে।" (পৃ. ১৫-১৬)

এই সমুদ্র উপকূলে এসেও তারা বসত নির্মাণে, বলা ভালো পুনর্নির্মাণে প্রস্তুত হয়। জঙ্গল সাফ করে সেখানে 'বাঁশের বেড়া আর গোলপাতার চাল মাথায় নিয়ে' ছোট ছোট ঘর ওঠে। 'মিঠে মাটিতে লাঙল' পড়ে। আর 'সমুদ্রের খাড়িতে মাছ মেরে' শুরু হয় জীবিকার্জনের প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গড়ে ওঠে 'নয়াবসত'। এতদিন জনমানবশূন্য এই ভূমির ছিল না কোন পরিচয়। আজ এই ভূমির মতোই কিছু পরিচয়হীন মানুষ এর নামকরণ করে এবং পরম মমতায় নোনা জলের পারের এই মিঠে মাটিকে ফসল উৎপাদনের যোগ্য বানিয়ে তোলে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নয়াবসতের বাসিন্দাদের মূল পেশা মাছ বিক্রি। নোনা জলের মিঠে মাছ ধরে ওরা সারারাত সমুদ্রের খাড়িতে। সকাল হতে না হতেই পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে গিয়ে পাতিবুনিয়ার হাটে সেই মাছ বিক্রি করতে হয় রোজগারের জন্য। এই প্রচন্ড শ্রমের মধ্যে বিশ্রামের কোনো ফুরসত নেই। ফুরসত নেই নিজের জীবন ও অস্তিত্বের কথা ভেবে দেখবারও। টিকে থাকার কঠিন সংগ্রাম তাদের অনবরত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের মৌলিক অধিকার থেকে এরা চিরকাল বঞ্চিত। এমনকি সরকারের কোন খাতায়ও অন্তর্ভুক্ত নেই এদের নাম। সাদামাটা অথচ সংগ্রামী জীবন তাদের। জন্মসূত্রে তারা 'কেউ বাউরী, কেউ বাগদী, কেউ মালো, কেউ কাহার' (পৃ. ১৬)। সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন - অন্ত্যজ প্রান্তিকায়িত ব্রাত্যজন। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে এসেছে তারা। জন্মগত বৃত্তি তাদের একসময় যা ছিল, তা এখন আর নেই। বারে বারে ছিন্নমূল হতে হয়েছে তাদের। অনবরত স্থানচ্যুত হতে হতে পেশাবদলও ঘটে গেছে বেঁচে থাকার তাগিদে। আজ তারা সব কিছু হারিয়ে শুধুই 'কৃষাণ আর মাছমারা' (পৃ. ১৬)।

তথাকথিত ভদ্রসমাজের বাইরে এদের জীবন অগণিত প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ হলেও আমরা আখ্যানে দেখতে পাই তারা এই নয়াবসতে গড়ে তুলেছে একটি ছোট্ট জনপদ। কুবের সাঁইদার, মোতি, গগন, বিলাস, কুঞ্জ, গুপী, নিশি, ভামিনী প্রভৃতিরা দরিদ্র যাযাবর জীবনের নানা পর্ব অতিক্রম করতে করতে আজ এখানকার বাসিন্দা। কুবের সাঁইদার এদের মুরুব্বি। সারাদিন খাটুনির পর তারা সবাই সন্ধ্যায় এসে কুবেরের ঘরের সামনে 'আসর' বসায়। কোনদিন গান হয়, নতুন আবাদ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়, মাছের ব্যবসা নিয়ে কথাবার্তা হয়। কুবের তাদের আগলে রেখেছে সবসময়। তাদের ভালোমন্দের ভার কুবেরের উপর। মানুষ তো আসলে সামাজিক জীব। প্রতাপ শৃঙ্খলিত জীবনে যতই পিছিয়ে পড়ে গিয়ে সে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক না কেন, শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে এসেও সে বার বার উঠে দাঁড়ায়। সংঘবদ্ধ হয়। শ্রান্তি, ক্লান্তি ভুলে গিয়ে প্রাণ ভরে গ্রহন করে প্রকৃতি মায়ের আলোকসুধা। কবির শাশ্বত উচ্চারণ যেন ধ্বনিত হয়, -

> "আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
> যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিল ইতিহাসে।"[৩]

কুবের সাঁইদারের কথায় সেই আশার স্পর্শ সামান্য ফুটে ওঠে যখন সকলকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, - "দু বচ্ছরের ভেতর কেউ তো আমাদের তাড়াতে এল নি। মনে হচ্চে, এ জায়গাটার মালিক লেই।" (পৃ. ১৭) আসলে তারা যেখানেই বসত গড়েছে এতদিন, সেখান থেকেই উৎখাত হয়েছে। কুবেরের বক্তব্য থেকে জানতে পারি, "হেই সুখচরে, পাতিবুনেতে, মাতলায় – কুথাও পুরো বচ্ছর কাটাতে পারিনি। ...খালি ঘুরেই মরচি। এট্টুস মাটির খোঁজে পিরথিমীর এক মাথা ঠেঙে খেদানি খেতে খেতে আর এক মাথায় এসে পড়েচি।" (পৃ. ১৮) সেই তুলনায় আজ অনেকটা সময়কাল অর্থাৎ দু'বছর এক জায়গায় স্থিতীশীল হওয়া তাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার বৈকি! আবেগে কুবেরের চোখ ভরে আসে। সেই আবেগ চারিয়ে যায় বাকি সবার মধ্যেও। ওদের মধ্যে বিশ্বাস জাগে, এই জমি তাদেরই।

সবার ভেতরের কর্মোদ্যম যেন ভিন্ন মাত্রা পায়। আপন জমিকে আরো চৌরস করতে হবে, যত্ন করতে হবে। পায়ের নিচের এই এক টুকরো উর্বর কালো মাটিকে তারা আরো সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে তুলবে। সবাই মিলে পরামর্শ করে সমুদ্রের নোনা জল থেকে ধানক্ষেত বাঁচানোর জন্য ক্ষেত বরাবর মাটি চাপা দেওয়ার কথা ভাবে। যাতে পরবর্তী 'দু-দশ বছরের ভেতর' মাটি নষ্ট হয়ে না যায়। আমরা দেখি "মেয়ে-মরদ, জোয়ান-বুড়ো, বাচ্চা-কাচ্চা—নয়াবসতের কেউ আর ঘরে রইল না। কোদাল আর ঝোড়া নিয়ে মুরুব্বির পিছু পিছু খাড়ির দিকে ছুটল।" (পৃ. ২৮) তারা ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার কথা ভাবে। জীবনে এই প্রথমবার স্থিরতা প্রাপ্তির আনন্দে আনন্দিত হয়।

এরপর কাহিনির গতি আমরা অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে বয়ে যেতে দেখি। নয়াবসতকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সমাজ। সে সমাজ কালে কালে নিজস্ব গতি লাভ করে। পাতিবুনিয়ায় গুপীদের মাছের কারবার চলতে থাকে। ভাঁটুনী বুড়ির আগমন ঘটে। পরবর্তীতে আসে গেঁওখালির বানভাসি কিছু মানুষ। দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে আখ্যান এগিয়ে চলে। এছাড়া নয়াবসতের লৌকিক জীবনচিত্রকে অনেকটা প্রাণবন্ত করে তুলেছে উপন্যাসে বর্ণিত

লোকগানগুলো। এরই মধ্যে বেশ কিছুটা অংশজুড়ে আমরা দেখতে পাই গুপী, নিশি ও ভামিনীর সম্পর্কের টানাপোড়েন। এ পর্বে কাহিনি কিছুটা বিলম্বিত হয়ে উঠেছে যেন।

যাই হোক, এরপরই আখ্যান পরিসরে আগমন ঘটে একটি নতুন চরিত্রের, যার নাম ভূষণ। ভূষণ সেই লোক যে এদের কাছে জমির মালিকদের সম্পর্কে খবর এনে দেয়। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বোঝার জন্য ঔপন্যাসিকের ভাষ্য অনুসরণ করতে পারি আমরা, "পৃথিবীর কোন মাটিই বেওয়ারিশ নয়। ফলে যতবার তারা বসত করেছে, ততবারই একজন করে মালিক বেরিয়ে পড়েছে। আর সেই মালিকদের খবর প্রথম যার মারফত পাওয়া গেছে, সে ভূষণ! ...সে খবর দেবার ক'দিন পরেই মালিকের লোক টাঙি-বল্লম নিয়ে হানা দিয়েছে।" (পৃ. ৯৭)

তাই ভূষণের উপস্থিতি তাদের জন্য চিন্তাজনক। যদিও ভূষণ আখ্যানে জমিমালিকদের প্রতিনিধিত্ব করে না কোনোভাবেই। সে আসলে একজন সামান্য দোকানদার। পাতিবুনিয়ার হাটে তার দীর্ঘ বিশ বছর পুরোনো মুদির দোকান। কিন্তু দোকানঘর জীর্ণ, শ্রীহীন। ব্যবসায় তার মন নেই। তার নেশা তথ্য সংগ্রহে। কোন জমিদার কোথায় নতুন জমি কিনল, কোন ভেড়িবাবু কোথায় জমি ইজারা নিল এসব আশেপাশের সমস্ত তথ্য সে সংগ্রহ করে রাখে। আর সময়মতো কুবের/কুবের'দের মতো এ অঞ্চলের অন্যান্য হতদরিদ্র মানুষদের সে খবর দিতে থাকে, যাতে কেউ হঠাৎ কোনো বিপদে না পড়ে। সে আসলে সবার ভালো চায়।

কুবেরদের জন্যেও ভূষণ মনেপ্রাণে মঙ্গলকামনাই করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে প্রতিবার জমি হারানোর শঙ্কা সে-ই বয়ে নিয়ে আসে তাদের জীবনে। আখ্যানের শেষভাগে দেখতে পাই আবারো ভূষণ এসেছে তাদের কাছে বঙ্কিমকে সঙ্গে নিয়ে, যে আসলে 'মেদিনীপুরের ভেড়িবাবুদের' গোমস্তা। সেই বঙ্কিম কুবেরকে জানায়, "তুমরা যেখেনে গাঁ বসিয়েচ, মেদিনীপুরের ভেড়িবাবুরা ও জায়গাটার মালিক। ...ভেড়িবাবুদের ইচ্চে, সমুদ্দুরের মুখে মাছের ভেরি বসাবে, বুঝলে। ...আসচে মাসের ভেতর ওখেন ঠেঙে তুমাদের উটে যেতে হবে। ...আসচে মাসে ভেড়িবাবুরা জমিনের দখল লিতে যাবে।" (পৃ. ১৪১) অর্থাৎ পুনর্বার উচ্ছেদ ঘটবে তাদের এই জমি থেকেও। লক্ষণীয় যে, ওদের এখানে বসত গড়ে তোলার প্রায় দু'বছর হতে চলেছে (কুবেরের বক্তব্য থেকে যা আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি), এর আগে এই অঞ্চল ছিল গহীন জঙ্গল। কারোরই অধিকৃত অঞ্চল ছিল না তা। কুবের-গুপীরা আপন চেষ্টায় এই ঘন অরণ্যকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আজ যখন এই অরণ্যভূমি শস্যদায়িনী হয়ে উঠল, ঠিক তখনই এর জমিমালিক এসে উদয় হলেন। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে আসলে এই মালিকানা-দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা শুধুই আধিপত্যবাদী সমাজের ক্ষমতালোভী মানসিকতার কূটচাল। এই গহীন অরণ্য যখন বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল তখন এর কেউ দাবীদার ছিল না। আজ তা বাসযোগ্য স্থান, তাই অবধারিত ভাবেই এখন এর মূল্য নির্ধারিত হবে। হিসেবি সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত হয়ে যাবে এই 'জমি'। অসহায় আর্তনাদে কুবের চেঁচিয়ে উঠে, "সমুদ্দুরের মুখের মাটিটুকুনেরও মালিক আচে!" (পৃ. ১৪১) -- আছে বটে। এটাই তো এই সমাজের প্রতাপ শৃঙ্খলের স্বরূপ। স্বাধীনতার তিন দশকের চেয়েও বেশি সময় পরে রচিত (১৯৮৪ সাল) এই ঔপন্যাসিক প্রেক্ষাপটে যে সামাজিক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয় তা সরাসরি অঙ্গুলিসঙ্কেত করে আসলে স্বাধীনতারও বহু যুগ পূর্ব হতে নিরঙ্কুশভাবে চলে আসা ক্ষমতায়নের আগ্রাসী শাসন কাঠামোর দিকে। সমালোচকের ভাষ্যের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হয় আধিপত্যবাদী মনস্তত্ত্ব, -

> "ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শাসকেরা একদিন বিদায় নেয়। কিন্তু আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো এত সহজে ভেঙে পড়ে না।"[৪]

এর রূপবদল হয়, হাতবদল হয় মাত্র। আমাদের মনে পড়ে যায় গ্রামশি-র প্রতাপের তত্ত্বসূত্র, -

> "...the directedness of power in power relations attempts to maintain the balance of power."[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফলত নিম্নবর্গীয় জনজীবনে অব্যাহত থাকে সংগ্রামের ধারা। আর তাই গহীন অরণ্য যখন কুবের'দের অমানুষিক পরিশ্রমে বাসযোগ্য-কর্ষণযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হয়, শাসকদলের তথা জমিমালিকদের অবধারিত আগমন ঘটে।

জীবনের দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসেও কুবের হার মানে নি কখনও, নিরুৎসাহ হয়নি। কিন্তু আজ সে যেন কিছুটা ভেঙে পড়ে। আবারও ভূমিহারা হয়ে পড়ার আশঙ্কা তাকে দিশাহারা করে তোলে। যে মাটির খোঁজে এরা গোটা জীবন ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে, প্রবল অনিশ্চয়তা ও বিপদের মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করেছে, সেই মাটির সন্ধান কি তারা আজও পাবে না – তা হতে পারে না! তাই সাময়িকভাবে বিপন্ন বোধ করলেও সেই সময়টুকু কাটিয়েই কুবের আবার দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়ায়। নয়াবসতের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্য করে বলে, "এখেন ঠেঙে কুত্থাও যাব নি। সারা জীবন কুকুরের মতন ঢের খেদানি সয়েচি। বার বার বসত গড়ে বার বার ফেলে গেচি। কিন্তুক আর পারব নি, কিচুতেই লয়। তাতে যা হবার হবে –" (পৃ. ১৪৩)

আমরা জানি ক্ষমতায়নের মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত প্রতিবাদ প্রতিরোধের সার্বিক অবলুপ্তি এবং ক্ষমতার সর্বগ্রাসী বিস্তার। শাসক মন পরোয়া করে না শাসিতবর্গের জীবনসংগ্রামের, ন্যায্য অধিকারের। জাতি বর্ণ বিত্ত বিভাজিত সমাজে তাদের রাজধ্বজা শাশ্বত করে রাখতে চায় চিরকাল। কিন্তু সময় ও জীবন পরিবর্তনশীল। আর তাই আধিপত্যবাদী সমাজ নির্মিত শোষণের অচলায়তনের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে সমাজের অন্তেবাসীশ্রেণীর কণ্ঠে এভাবেই জেগে ওঠে শাশ্বত প্রতিরোধী উচ্চারণ। কুবের'দের কাছে হারাবার মতন কিছুই আর নেই। গোটা জীবন তারা শুধু দিয়েই গেছে, তাদের শ্রম, তাদের শক্তি। বিনিময়ে পায় নি কিছুই। একদিকে জমিমালিকদের ক্ষমতালোভী আগ্রাসী থাবা, অন্যদিকে সমুদ্র উপকূলের প্রকৃতির ঝড়োন্মত্ত করাল রূপ। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজ তারা আর চলে যাবে না। বরং মুখোমুখি দাঁড়াবে, জমিমালিকদের। কুবেরের কণ্ঠ দিয়ে সেই প্রতিবাদের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সকলের মধ্যে।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, কুবেরের সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের উল্টোদিকে বসে থাকা মানুষগুলো তখন 'ভীত, চকিত, বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন' (পৃ. ১৪৪)। কেননা প্রতাপের কুৎসিত রূপ তাদের চেতনায় বড় স্পষ্ট। একদিকে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে এই সমাজে তাদের নিরালম্ব অবস্থানের স্বরূপকে। অন্যদিকে, আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আধিপত্যবাদীশ্রেণী যে শৃঙ্খল বিস্তার করে ব্রাত্যজনদের জীবনে, তা শুধুমাত্র তাদের জীবনকেই নয়, চিন্তা ও মননকেও অনেকটাই স্থবির করে দেয়। সুদীর্ঘকালের শৃঙ্খলিত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাবার ফলে ভুলে যায় প্রতিবাদের সমস্ত ভাষাও। ফলত ভয় ও উদ্বিগ্নতায় তাদের সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তখন প্রতাপের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সগর্জন উচ্চারণও তাদের প্রজন্ম লালিত ভীতির নিগড়কে সহজে ভাঙতে পারে না। ফলে গোটা পরিস্থিতিটাই বেশ জটিল হয়ে উঠে। স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে তৈরি হয় দুস্তর ব্যবধান। আখ্যানে আমরা দেখি, কুবের তাদের একমাত্র ভরসাস্থল। তার হাত ধরেই তারা প্রতিবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তবুও আজ আবার জমিমালিকদের অবাঞ্ছিত আগমন সংবাদ তাদের জীবনে ভীতি ও অনিশ্চয়তার ঝড়কে যেন ডেকে এনেছে। আখ্যানে বর্ণিত উপকূলের দিকে ধেয়ে আসা ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় যেন এরই ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কুবের কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না এই 'নয়াবসত'কে। না ঝড়ের কারণে, না জমিমালিকদের কারণে। তাদের জাতি, বর্ণ ও দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনে 'নয়াবসত' স্থিরতার প্রতীক। তাই নয়াবসতকে রক্ষা করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি, ঝড় আসার আগের মুহূর্তে কুবের গুপীকে দায়িত্ব দেয় যতজনকে পারা যায় তার ঘরে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেওয়ার জন্য, কেননা এই বসতে একমাত্র কুবেরের ঘরটাই শক্ত টিনের তৈরি। কিন্তু গুপী, যে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী, "...যেন সমুদ্র মুখের এই সামান্য মাটিটুকুর প্রতীক" (পৃ. ১৪৮), - নিশির সঙ্গে নয়াবসত ছেড়ে গোপনে চলে যায় প্রেমের টানে, নতুন জীবনের খোঁজে।

তার এই চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে কুবেরের জন্য এবং নয়াবসতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুবেরের গভীর ইচ্ছা ছিল, নিজের মেয়ে ভামিনীর সঙ্গে গুপীর বিয়ে দেওয়া। ভামিনীও গুপীকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু গুপীকে কখনও এই বিয়ের জন্য প্রস্তুত দেখা যায় না। নিশির প্রতি তার অন্তরের টান তাকে ভামিনী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। যখন কুবের গুপীর মনের কথা বুঝতে পারে তখন কিছুটা জোর করেই সে গুপীর সঙ্গে ভামিনীর বিয়ের কথা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 493
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সামাজিকভাবে পাকা করে নেয়। যা গুপীর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে আমাদের মনে হয় যেন এই বিন্দুতে এসে কুবের ও গুপী দুজনেরই মনোদশার প্রায় মিল রয়েছে। দুজনেই স্বাধীন স্থিতিশীল জীবনের প্রত্যাশী। কুবের চায়, নিজের জন্য ও তার এই ছোট্ট জনপদের জন্য ভেড়িবাবু বা জমিদার বর্জিত একটুকরো স্বাধীন জমি, যেটা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের মাটি হবে। আর গুপীও চায় 'নিজেদের জমিন', তার সেই চাওয়ায় সঙ্গে যুক্ত হয় নিশির স্বাধীন জীবনের আকাঙ্খা। কুবের প্রস্তুত হয় শাসক নির্মিত বেড়াজালকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে। আর গুপী তার জীবনের আশেপাশে গড়ে উঠতে থাকা কুবের তথা এই সমাজের বেড়াজালকে ডিঙিয়ে বেরিয়ে যায় নিশির প্রবল টানে। আসলে মানবমন স্বভাবতই স্বাধীনতার পিয়াসী। যে কোনো শৃঙ্খলই, হোক তা শাসকের অথবা সমাজের, তাকে চিরকাল আবদ্ধ রাখতে পারে না। প্রতিবাদ আসলে মানবমনের চিরন্তন সুর। হোক তা সোচ্চার, অথবা নিরুচ্চার। প্রতিবাদের ধ্বনিই মানবসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তাকে ভুলতে দেয় না আপন স্বাত্যন্ত্রবোধকে। গুপী মনে মনে নিশির সেই আকর্ষণেরই অপেক্ষা করছিল হয়তো। কুবেরকে সে সমীহ করে। নয়াবসতের প্রতিও সে দায়িত্বশীল। কিন্তু মনের ইচ্ছার বিপরীতে গিয়ে ভামিনীকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিশির আহ্বানে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিঃশব্দে নয়াবসত ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কুবেরের প্রতি এ যেন তার নীরব প্রতিবাদ।

কিন্তু ঔপন্যাসিক প্রদত্ত উপরোক্ত উপমা এক্ষেত্রে কুবের তথা নয়াবসতের জন্য বিপদ সংকেত বয়ে নিয়ে আসে যেন। প্রতাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবনযাপন, বঞ্চনা লাঞ্ছনার পরিবর্তে স্বনির্ভরশীল জীবন কাটানোর স্বপ্ন সমাজের এই প্রান্তিকায়িত বর্গের মানুষদের যেন পূর্ণ হতে গিয়েও আর হয়ে ওঠে না। আখ্যান বয়নের শেষভাগ তাই যেন অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে গুপীকে এই উপকূল সংলগ্ন মাটির সঙ্গে তুলনা করায়, যে 'মাটি' হয়তো বা আবারও হারিয়ে যেতে পারে! যার উপর শ্যেনদৃষ্টি এসে পড়েছে ভেড়িবাবুদের। বসত খালি করে সমুদ্রের মুখে মাছের ভেরি বসাতে চায় তারা।

গুপী-নিশি চলে যায়। নয়াবসতের অন্যান্য বাসিন্দারা ভীত। শুধুমাত্র দমে যায় না কুবের। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে কিছু অসহায় নিরীহ মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে নয়াবসতের মুরুব্বি কুবের সকলের ধন-প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকে যেন কোনো সুবিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো। কুবের'দের প্রান্তিকায়িত ব্রাত্য জীবনে অধিকার অর্জনের মুহূর্তেই হারানোর আশঙ্কা যেমন ঘনিয়ে আসে, ঠিক তেমনি হারাতে হারাতেই পুনর্বার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয় 'ওরা'। এই সংগ্রামপূর্ণ পথ চলা চলতেই থাকে। আর এভাবেই পাঠকৃতির সূচনাপর্ব আর সমাপ্তি মুহূর্ত একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে যায়। 'মাটি' তথা স্বাধীন স্থিতিশীল জীবনের খোঁজ তাদের শেষ হয় না আর। তাই এই বৃত্তান্তেরও আর অন্ত হয় না। অধিকার অর্জনের পথে প্রতাপের আগ্রাসী থাবা আর তার বিপরীতে প্রতিরোধের দৃঢ় প্রত্যাঘাত যেন এক ক্রমচলমান ধারা হয়ে ওঠে।

Reference:

১. নাথ, প্রিয়কান্ত, 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ২৩

২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর - ১ প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ – ২০০২ পৃ. ১৪১

৩. দাশ, জীবনানন্দ, 'আবহমান' কবিতা, 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, পৃ. ৫৬

৪. প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, তদেব, পৃ. ১২৬

৫. Antonio Gramnsci (Beyond Marxism and Postmodernism), Renate Holub, Routledge, London, First Published- 1992, P. 200

Bibliography:

নাথ প্রিয়কান্ত, 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা–৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৭

ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-১ প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০২

দাশ জীবনানন্দ, ‘আবহমান’ কবিতা, ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ভারবি, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৪

Antonio Gramnsci (Beyond Marxism and Postmodernism), Renate Holub, Routledge, London, First Published, 1992

বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা, ‘স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘সময় সমাজ সাহিত্য’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৪১২ বঙ্গাব্দ

চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রকাশ, ‘এই সমাজ এই সময়’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০০২